জঙ্গিবাদের ধর্মমনস্তত্ত্ব

ড. আহমদ আনিসুর রহমান

পূর্বকথা : ধর্ম নিয়ে লিখতে মন চায় না। ধর্ম লিখবার জিনিস নয়, বোধের বিষয়। সেই ধর্মকে যখন আবার জঙ্গিবাদের সঙ্গে মিলিয়ে লিখতে বলা হয়, তখন আরো অরুচি হয়। ধর্ম তো শান্তি, সদাই শান্তি। দেয়ালে পিঠ ঠেকে না যাওয়া পর্যন্তই যেন শান্তি।

তারপর অনুজপ্রতীম ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে দেশে ধর্ম আর জঙ্গি মনোভাব নিয়ে যা কিছু হচ্ছে, তা বুঝতে সাহায্য হবে এমন কিছু লিখবার দায়িত্ব এড়াতে পারলাম না। যতটুকু বুঝি বলে মনে হলো লিখলাম। বিদেশে থাকি বাধ্য হয়ে, দেশের তরুণতর প্রজন্মের এতোটুকু অনুরোধও না রাখলে অপরাধী মনে হবে তাই।

প্রকৃত ধর্মের জয় হোক, শান্তির জয় হোক, বাংলাদেশে শান্তি হোক, এই আশা নিয়েই। -আ. আ র

ছোটবেলায় পাড়ায় বন্ধু ছিল। শুনতাম, তারা আহলে হাদিস। খুব একটা বুঝতাম না এর অর্থ কি। কিন্তু যেভাবে বলা হতো ফিসফিস করে, 'ওরা আহলে হাদিস' তাতে বুঝতাম কিছু একটা অসুবিধে আছে হয়তো 'আহলে হাদিস' হওয়া নিয়ে। কিন্তু তাতে আমাদের কোনো অসুবিধে হয়নি। তলস্তরের শিশুবন্ধুদের নিয়ে লেখা বিখ্যাত গল্পের শিশুদের মতো আমরা বন্ধু ছিলাম। তার বাবাকে আমরা চাচা ডাকতাম। খুব স্নেহশীল ছিলেন। অনেকটা সৌম্যমূর্তি যেন।

পরে বড় হবে আরো অনেক আহলে হাদিসের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাও হয়েছে। তাদের কাউকে কখনো 'জঙ্গি' মনে হয়নি। আর দশজনের মতো জাতিধর্ম নির্বিশেষে দেশে বিদেশের জীবনে দেখেছি দশজনের মতোই যেন তারাও। আলাদা কোনো জঙ্গিদের দেখিনি, সেভাবে তাদের আলাদা করে দেখে মিশিওনি। মানুষ হিসেবে আজও তাঁরা আমার বন্ধু। সুখে-দুঃখে আজও দরকার হলে তাদের পাশে দাঁড়াব, যেকোনো মানুষের জন্য যেমন।

জঙ্গিবাদ : কিন্তু এই হঠাৎ করে 'আহলে হাদিস' আন্দোলনের অসাধারণ জঙ্গি কান্ড কারখানার খবর এটা কেমন কথা। এর মূল কোথায়? এটা বোঝা দরকার। তা না হলে, 'আহলে হাদিস' সম্প্রদায়, 'আহলে হাদিস আন্দোলন' মাদ্রাসা- মক্তবে রিক্রুট' করা জঙ্গি, আর মাদ্রাসা- মক্তবে পড়া না সেখান থেকে বের হওয়া সাধারণ ছাত্র প্রাক্তন ছাত্র- আর বেশ ভূষায় তাদের সঙ্গে মিল- এসবকে লেজে গোবরের মতো এক করে ফেলে দেখবার প্রবণতা দেখা দিলে, জঙ্গিবাদকে তার লুকিয়ে থাকার ক্ষেত্র থেকে আলাদা করে বের করে আনা হবে অসম্ভব। প্রতিবিদ্রোহী প্রতিরক্ষা তত্ত্বেও যাঁদের সামান্যটুকু জ্ঞানও আছে, তাঁরাই বুঝবেন এই অসম্ভব কতো মারাত্মক হতে পারে। আহলে হাদিস সম্প্রদায়, মাদ্রাসা-মক্তব, দাড়ি-টুপি এক বিষয়। আর 'আহলে হাদিস আন্দোলনে'র নামে জঙ্গিবাদ অন্য। পরেরটা ধরতে গিয়ে আগেরটার হয়রানি যেন না হয়! এই খেয়ালটা প্রথমেই করতে হবে। তারপর এই নিবন্ধের মূল বিষয়বস্তুতে আসি।

প্রধান ধারা, পার্শ্বধারা : 'আহলে হাদিস' সম্প্রদায় মূলত নানা নামে ইসলামের মূলধারা থেকে উৎসাহিত হয়ে নিজ খাতে প্রবাহিত হয়ে পড়া বিভিন্ন পার্শ্বধারা থেকে জন্ম নেয়া সম্প্রদায়গুলোরই একটি। ইসলামের মূলধারাকে বলা হয় 'আহলুস্ সুন্নত ওয়ল জমায়ত'। এর অভ্যন্তরে সৃষ্ট অন্তর্ধারাগুলো তেমনই যেমন স্রোতস্বিনীর ভেতরকারই বিভিন্ন ধারা। আর তা থেকে উৎসাহিত হয়ে প্রবাহিত হয়ে পড়া পার্শ্বধারাগুলো স্রোতস্বিনীর শাখা প্রশাখা হয়ে বেরিয়ে পড়া পার্শ্বনদীর মতো। প্রধান অন্তর্ধারাগুলো দু'প্রকার, প্রধানত- 'মজহব' আর 'তরীকা'। 'মজহব' হলো ইসলামের মূলধারার বাহ্যিক কর্মধারা সংক্রান্ত নিয়মকানুনগত অন্তর্ধারা। আর 'তরীকা' হলো ইসলামের মূলধারার মনোঃজাগতিক, অন্তর্গত আত্মসংশোধনমূলক নিয়ম কানুনগত অন্তর্ধারা। একসময় 'মজহাব' প্রায় বারোটির মতো ছিল। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পূর্ণাঙ্গ ইসলাম শিক্ষাদানের তিন পুরুষের ভেতরই বাহ্যিক ধর্মগত এই বারোটি অন্তর্ধারা পারস্পরিক আত্মস্থায়নগত প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে চারটে 'মজহবে' সীমিত ও সুসংহত হয়। 'মজহব' চারটে হলো 'হানাফী', 'মালিকী' 'শাফেয়ী', 'হাম্বলী'। মজহব চারটেই মূলত হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পার্থিক জীবনকালেই সূচিত হয়ে, তার 'সঙ্গী' সাহাবীগণের (রাঃ) ভেতর দিয়ে, তাঁদের 'অনুগত' (তাবেয়ী) ও 'তস্যানুগত' (তবয়ে তাবেয়ী) (রাঃ)দের সময়ে পরবর্তী পুরুষদের জন্য বিকশিত রূপে প্রকাশিত হয়। ঐ তিন পুরুষের প্রতি পুরুষেই 'মজহব'গুলো সংশ্লিষ্ট পুরুষে তাদের প্রধান অনুসারীদের কোনো না কোনো একজনের 'অনুসরণীয় পথ' হয়ে প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে। এভাবেই 'তাবেয়ী'/ 'তবয়েতাবেয়ী' (রাঃ)-দের পুরুষে এসে এগুলো প্রসিদ্ধ তাবেয়ী হজরত আবু হানীফা (রাঃ) আর হজরত মালিকের (রাঃ), আর প্রসিদ্ধ 'তবয়ে-তাবেয়ী' শাফেরি (রাঃ) আর আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ)-এর 'অনুসরণীয় পথ' (আরবিতে এই 'অনুসরণীয় পথ' কথাটির আক্ষরিক অনুবাদই হলো 'মজ্হব')। তাঁদের পুরুষের পূর্বে, 'সঙ্গী' তথা 'সাহাবী' (রাঃ)-এর পুরুষে এই একই 'মজহব' সে সময়কার কোনো কোনো প্রসিদ্ধ 'সঙ্গী'/ 'সাহাবী' (রাঃ)-এর 'অনুসরণীয় পথ' বা মজহব হিসেবে পরিচিত ছিল। উদাহরণ স্বরূপ, যা পরে 'আবু হানীফা'র তথা 'হানাফী', মজহব হিসেবে পরিচিত হয়, তা 'সঙ্গী'/ 'সাহাবী' (রাঃ)-দের পুরুষে 'আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ' (রাঃ) আর আলী ইবনে আবি তালি (রাঃ)-এর মজহব হিসেবে আখ্যা হতে পারতো। যা 'তাবেয়ী'/ 'তবয়ে- তাবেয়ী' (রাঃ)-দের পুরুষে 'মালেকী' মালিক (রাঃ)-এর তথা 'মালিকী' মজহব হিসেবে পরিচিত হয়, তা তার পূর্বে, 'সঙ্গী'/ 'সাহাবী' (রাঃ)-দের পুরুষে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর 'মজহব' হিসেবে আখ্যা হতে পারতো।

বোঝাই যাচ্ছে, মজহবসমূহ যাঁদের নামে তা পরিচিত হয়ে পড়ে, তাদের দ্বারা সূচিত নয়। শুধু তারা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সুন্নত- তথা তাঁর অনুমোদিত ধর্ম পালন 'রীতি' অনুসরণে বৈধ বিকল্প পদ্ধতি অনুসরণ করেন, সেসব বিকল্প পদ্ধতিকে আলাদাভাবে চিনবার জন্য ঐসব অনুসরণ-পদ্ধতির (আক্ষরিক ভাবে 'মজ্হব') সঙ্গে তাঁদের কারো কারো নাম জুড়ে দেয়া হয়। বিষয়টি অনেকটা এই রকম যে ঢাকার সংসদ ভবন যাবার চারটা বিকল্প পথ তৈরি করে দিয়ে গেছেন কেউ। পরে ঐ বিকল্প পথগুলো চিনবার জন্য যে পথ ধরে যাওয়া-আসা করেন সেই পথের বহু পথচারীর এক বিখ্যাত পথচারী- সেই পথের নাম হয়ে গেল, সেই বিখ্যাত পথানুসারীর নামে। অন্য বিকল্প পথগুলোর নামকরণও হয়ে গেল সেভাবেই। এর অর্থ অবশ্যই এই নয় যে বিকল্প পথগুলো, যাঁদের নামে তা পরিচিত হয়ে পড়লো- তাদেরই সৃষ্ট। মজহবের বিষয়টিও ঠিক এ রকম। বিকল্প চারটে মজহবই খোদ হজরত মোহাম্মদের (দঃ) 'সুন্নত' থেকে।

ঐক্যভিত 'মজহব' : হজরত মোহাম্মদের (দঃ) অনুমোদিত এই 'সুন্নত' সন্ধান আর তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পদ্ধতির পার্থক্য নিয়েই চারবিকল্প সুন্নত 'অনুসরণ পদ্ধতি' তথা 'মজহবের' পার্থক্য। এই পার্থক্য যেহেতু একই 'আকীদা' অর্থাৎ বিশ্বাসমালা, আর বিশ্বাসের আকররূপ কোরআন অনুসরণে সুন্নত সমগ্রের অনুসরণের প্রত্যয়ের আওতায় সেহেতু পার্থক্য আওতায়, সেহেতু পার্থক্য সত্ত্বেও চার 'মজহব'ই ইসলামের একই, প্রধান মূলধারার অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অন্তর্ধারা মাত্র।

একই বিষয় ধর্মনীতি পালনের মনোজাগতিক আত্মশুদ্ধিগত চর্চামূলক বিকল্প 'তরিকা'গুলোর ক্ষেত্রেও। আরবিতে 'মজহব' আর 'তরিকা' দুটো শব্দেরই আক্ষরিক অর্থ মোটামুটি এক- 'অনুসরণীয় পথ' বা 'অনুসরণীয় পদ্ধতি।' তাই হজরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ ইসলাম শিক্ষা দেয়া থেকে নিয়ে প্রথম দিককার যুগত্রয়ে শব্দ দুটিই এবং আরো সমার্থ অন্যান্য শব্দ যথা, উদাহরণস্বরূপ, 'মিনহাজ' বা 'নহজ' সবই, আজকে 'মজহব' আর 'তরিকা' বলতে যে দুই ভিন্ন প্রকারের 'অনুসরণীয়' 'পথ' বা 'পদ্ধতি' বোঝায়- তার দুটোকেই বোঝাতো। যেভাবে প্রথম দিকে 'সালাত', 'সিজদা' কোরআন', এমনকি 'মসজিদ' শব্দটিও আজকে যাকে 'নামাজ' বা 'সালাত' বলে তা বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হতো- আবার ঐ একই শব্দ অন্যান্য বিষয় বোঝাতেও ব্যবহৃত হতো। আরবিভাষীরা স্থান কাল পাত্র ভেদে একই শব্দের কোনো ক্ষেত্রে কোন ভিন্ন অর্থ হবে আবার কোন ক্ষেত্রে কোনো ভিন্ন ভিন্ন শব্দের একই অর্থ হবে, তা সহজেই স্বভাবতঃই বুঝে নিতেন। কিন্তু পরে আরবের চেয়ে অনারবরাই ইসলামে বেশি বেশি দাখিল হতে শুরু করলে, এক একটি শব্দকে এক একটি বিশেষ বিশেষ অর্থের জন্য বেঁধে দেয়ার রীতি হয়। এভাবেই 'মজহব' আর 'তরিকার কথা খোদ কোরআন শরীফে হাদিস শরীফে '(ম) জহব, 'তরীকা', 'নহজ'/ 'মিননহাজ' হিসেবে উল্লেখিত হলেও, পরবর্তীকালে, 'মজহব' বলতে প্রধানত ধর্মরীতির বাহ্যিক অনুসরণ পদ্ধতি আর 'তরিকা' বলতে মনোজাগতিক, অন্তর্গত অনুসরণ পদ্ধতি বোঝায়।

সব 'মজহব' আর সব 'তরিকা'-ই যেহেতু একই 'আকিদা' তথা 'বিশ্বাসমালা' - আর একই সুন্নত সমগ্রের আলোকে কোরআনশরীফ নির্দেশিত ধর্মানুশাসন পালনের প্রত্যয়ের আওতায় থেকেই পারস্পরিক বিকল্প- সেইহেতু সুন্নত বিশ্লেষণ পদ্ধতিগত কিছু পার্থক্য সত্ত্বেও, তার সবগুলোই সবগুলোকে শুদ্ধ বলে স্বীকৃতি দেয়। তার ফলে তাদের পার্থক্য ও পারস্পরিক স্বীকৃতি তাদের ভেতর সে রকম সুদৃঢ় ঐক্য স্থাপন করে যেমন একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (Federalism) একই শাসনতন্ত্রাধীন যুক্তরাষ্ট্রভুক্ত পরস্পর স্বীকৃতিশীল অথচ ভিন্ন ভিন্ন স্বায়ত্তশাসন অঙ্গরাজ্যগুলোর ভেতর করে থাকে।

ফেরকাবাজি : অন্যদিকে আছে বিভেদ সৃষ্টিকারী পার্থক্যমূলক 'ফিরকা'- বাংলায়, 'ফেরকা'-'ফেরকা'গুলোর বিষয়। এখানে পার্থক্যটাই ধর্মের মূলভিত্তি যে 'আকিদা' বা বিশ্বাসমালা- তারই কোনো কোনোটি এবং এই বিশ্বাস অনুসরণে বিশ্বাসের আকররূপ কোরআন শরীফের অনুশাসন পালনে সুন্নত সমগ্রের ভূমিকার মতো মৌলিক বিষয় নিয়েই। এই পার্থক্য যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় একই শাসনতন্ত্রাধীন পরস্পর স্বীকৃতিশীল অঙ্গরাজ্যের এই স্বীকৃতিভিত্তিক সুদৃঢ় ঐক্যের পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্ন শাসনতন্ত্রের দাবিদার, পরস্পর যুদ্ধংদেহী বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজ্যাঙ্গসমূহের অনৈক্যের মত। এই 'ফেরকা'গুলোই কালে ইসলামের প্রধান ও মূলধারার পাশাপাশি, ইসলামের ভেতরই নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী পার্শ্বধারা হিসেবে আবির্ভূত হয়। প্রায়শই এই বিভাজন শুরু হয় মূলধারার ভেতরেরই কোনো এক জায়গা থেকে, এবং কালে সেখান থেকে ক্রমে তা বেরিয়ে আসে মূলধারা থেকে আলাদা পার্শ্বধারা হয়ে। কোনো 'ফেরকারই নিজস্ব ধর্মতত্ত্ব অন্য 'ফেরকা'কে শুদ্ধ, বৈধ বা গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করে না। মাঝে মধ্যে রাজনৈতিক 'হেকমতের' কারণে অন্যথা বললেও। তাদের ধর্মতত্ত্ব সংবলিত মূল পুস্তকাদি দেখলেই তা বোঝা যাবে। অনেক সময় কোনো মজহবের বা তরীকার ছদ্মাবরণেও আসলে কোনো কোনো ফেরকা তাদের ফেরকাবাজি চালিয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ পারস্যে 'সফভী' তরিকা অনুসরণকারীদের ভেতর অনুপ্রবেশকারী শিয়া ফেরকার সদস্যেরা একসময় 'সফভী' তরিকার ছদ্মাবরণে পারস্যের শাসনক্ষমতা দখল করে নির্মমভাবে ইসলামের প্রধান ও মূলধারার অন্তর্গত বিভিন্ন মজহব ও তরিকার অনুসারীদের খুন ও দমন করে সেখানে শিয়া ফেরকার শাসন প্রতিষ্ঠা করে।

সুন্নত ও হাদিস : পূর্বেই দেখেছি ইসলামের প্রধান মূলধারার ভিত্তিই হলো কোরআন শরিফ বিধৃত বিশ্বাসমালার ভিত্তিতে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কর্তৃক অনুমোদিত ধর্মাচারনীতি তথা সুন্নতসমগ্রনির্ভর ধর্মানুশাসন পালন পদ্ধতির অনুসরণ। তা এই ভিত্তিসম্মত যেই বিরল 'মজহব' আর যেই বিকল্প 'তরিকার' ভেতর দিয়েই হোক না কেন।

এই সুন্নতসমগ্র আহরণ আর তার বিশ্লেষণ নিয়ে প্রথম দিককার সেই যুগেই- যার জ্ঞানগুরু যার সমাজসমগ্রের সঠিক পন্থানুসারী হওয়া সম্পর্কে খোদ হজরত মোহাম্মদ (দঃ)ই নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, দুই বিকল্প ভিন্ন পদ্ধতিপুঞ্জের উদয় হয়। একটিকে বলা হলো 'আহলুর রায়', অন্যটিকে 'আহলুল হাদিস'। লক্ষণীয়, এই 'আহলুল হাদিস' আর আজকের 'আহলে হাদিস' ঠিক এক নয়। নাম দুটির বানানে ও উচ্চরণে যেমন সূক্ষ্ম পার্থক্য। সেই নামাঙ্কিত পন্থিদ্বয়ের মূল উৎস, বিশ্বাস, বিষয়বস্তু সবকিছুতেই তেমনি রয়েছে এমন কিছু মৌলিক পার্থক্য, যা বোঝা দরকার। 'আহলুল হাদিস' আরবি শব্দপুঞ্জ 'আহলে হাদিস' ফারসি। আহলুল হাদিস' ইসলামেরই প্রধান ও মূলধারার অন্তর্গত। 'আহলে হাদিস' ইসলামের প্রধান ও মূলধারা তথা মজহবভিত্তিক 'আহলুম সুন্নত ওয়াল জমায়াত' বা 'সুন্নিগণের প্রতিপক্ষে মজহব অস্বীকারকারী এক পার্শ্বধারা। 'আহলুল হাদিস', 'জমায়াত' বলতে তার মূল আরবি অর্থ, অর্থাৎ মুসলমানদের সমাজসমগ্র বোঝে, আহলে হাদিস 'জমায়াত বলতে 'দল' তথা নিজেদের 'দল'টিকেই শুধু বোঝে। 'আহলুল হাদিস' আরবিভাষী, প্রথম যুগের ইমামগণের ধর্মানুমোদিত ইজতেহাদগত পার্থক্যজাত- এ জন্যই নামটি আরবিতে। 'আহলে হাদিস', তৎকালে ফারসি রাজভাষাধীন ভারতবর্ষে ১৮৪০-এর দশকে কলকাতার অ্যাংলিকান গির্জার উদ্যোগে সূচিত, হাদিস ব্যাখ্যার অপরাঙ্গম জনসাধারণ্যে সরাসরি হাদিস প্রচার ও পঠন-পাঠনের এক আন্দোলনের ফসল- তখনও রাজভাষা হিসেবে ফারসি চালু রাখা ইংরেজ সরকারের রেজিস্ট্রিতে ফারসি শব্দ 'আহলে হাদিস' নামে ভুক্ত হয়ে তার আত্মপ্রকাশ। এসব পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে আছে মৌলিক বিশ্বাসগত ও ধর্মপালনের পদ্ধতিতে সুন্নতসমগ্র সংক্রান্ত পার্থক্য। 'আহলুল হাদিস' হলেন 'মালিকী' ও 'হাম্বলী' মজহব অনুসারীগণ, আর 'আহলে হাদিস' কোনো মজহবই মানে না। এ বিষয় বুঝবার জন্য প্রথমে আহলুল হাদিস আর আহলুর রায়ের পার্থক্যও মৌলিক বিশ্বাসগত এবং সুন্নতসমগ্র সংক্রান্ত ঐক্য বোঝা দরকার। পরে আবার আহলে হাদিসে ফিরে আসবো।

সুন্নত, হাদিস, রায়, ভ্রান্তি ভঞ্জন : আগেই দেখেছি ইসলাম ধর্মের ভিত্তিই হলো সুন্নতসমগ্রের আলোকে কোরআন বিধৃত বিশ্বাসপূর্বক কোরআন নির্দেশিত ধর্মানুশাসন পালন। আর সুন্নত হলো, কোরআন বোঝেন যিনি সবচেয়ে বেশি কোরআন নাজেল যাঁর ওপর সেই হজরত মোহাম্মদের (দঃ) অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যাখ্যামূলক ধর্মরীতি, তথা জীবনাচার। এই যে সুন্নত- তার সমগ্রখানি তো এক বিশাল সমুদ্র। এই সুন্নতসমগ্রের সবটুকুর আলোকেই কোরআন শরিফের বিশ্বাসমালাকে বুঝে গ্রহণ করতে হবে, আর তার সবটুকুর আলোকেই কোরআন শরিফ নির্দেশিত ধর্মানুশাসন পালন করতে হবে। তা না হলে সুন্নতসমগ্রের খন্ডমাত্রের আলোকে ধর্মের কোনো বিষয়ই বুঝবার চেষ্টা হবে অন্ধের হাতি দেখার মতো। এ জন্যই ধর্মের প্রধান ও মূলধারা 'আহলুল সুন্নত ওয়াল জমায়াত ধর্মপালনের সুন্নতসমগ্রের এই মৌলিক এবং অপরিহার্য ভূমিকাকে যথাযথই এতো গুরুত্ব দেয় যে, ধর্মের এই প্রধান মূল ধারাটির নামটাই 'সুন্নত' শব্দকেন্দ্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জন্যই সংক্ষেপে বলতে গেলে এ ধারাকে 'সুন্নি'ই বলে। যদিও শিয়া এবং আহলে হাদিসের মতো পার্শ্বধারাগুলোও তাদের নিজ নিজ মতো সুন্নত পালনের কথা বলে ও তাতে আগ্রহী। কিন্তু তার সুন্নতসমগ্রের এই মৌলিক ভূমিকায় বিশ্বাসী নয়। শিয়াগণ তাদের ব্যাখ্যানুযায়ী নবী বংশ অনুসরণের অধীনে সুন্নতের যে খন্ডাংশ অনুসরণ সম্ভব তাতেই

আগ্রহী। আহলে হাদিসের অনুসারীগণ তাদের ব্যাখ্যানুযায়ী হাদিস অনুসরণের অধীনে সুন্নতের যে খন্ডাংশ অনুসরণ সম্ভব, তাতে আগ্রহী।

ধর্মের মূল ও প্রধান ধারা 'আহলুল সুন্নত ওয়াল', 'জামায়াত' কিন্তু নবীবংশের অনুসরণ এবং হাদিসের অনুসরণ। উভয়টাই ১০০% ভাগ করেও সুন্নতসমগ্রের আলোকে কোরআন শরিফের অনুশাসন ও ১০০% ভাগ অনুসরণের বাধ্যবাধকতাকে ধর্মের অপরিহার্য ভিত্তি মনে করেন। এখানে এসে হাদিস আর সুন্নতসমগ্রের পার্থক্য এবং অপরিহার্য সম্পর্কে আলোচনা দরকার।

ধর্মের শিয়া পার্শ্বধারা : হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রথমোক্ত কথাটি বাদ দিয়ে দ্বিতীয়টিকে ধরে এমন ব্যাখ্যা দিল যা ধর্মের প্রধান ও মূলধারার কাছে গ্রহণযোগ্য হলো না। আর বহু পরে আহলে হাদিস পার্শ্বধারা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) দ্বিতীয়োক্ত কথাটিকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে প্রথমোক্ত কথাটির এমন ব্যাখ্যা দিল, যে তাও ইসলাম ধর্মের প্রধান ও মূলধারার নিকট গ্রহণযোগ্য হলো না। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) অন্য এক ভাষ্যে বলে গেছেন বুঝের পার্থক্য দেখা দিলে 'সোয়াদ আল-আজম' তথা প্রধান মূলধারার সঙ্গে থাকবে। তাই দুনিয়ার সকব মুসলমানের প্রায় সবাই শিয়া বা আহলে হাদিস পার্শ্বধারার হজরত মোহাম্মদের (দঃ) উপরোক্ত দুই কথার এক কথা ছেড়ে অন্য কথা ধরে তার অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা গ্রহণ না করে। প্রধান মূলধারা আহলুল সুন্নত ওয়াল জমায়াতের হজরত মোহাম্মদের (দঃ) দুটো কথাকেই গ্রহণ করে উভয়ের সামঞ্জস্যমূলক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করলো। ওই দুই কথার এই ব্যাখ্যা মতে, পথভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে প্রকৃত ইসলাম ধর্মে নিশ্চিত টিকে থাকবার পথ হলো, 'আল্লাহর কিতাব' অর্থাৎ কোরআন শরিফকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরে অনুসরণ করা, যা হবে হজরত মোহাম্মদের সুন্নতসমগ্রের সেই ব্যাখ্যানুযায়ী যা তাঁর বংশের একমাত্র বেঁচে থাকা ইমাম হজরত জয়নুল আবেদীন (রঃ)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাঁর নিয়োজিত (মুসনদ) শিষ্যগণের মাধ্যমে সম্প্রচারিত। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই তার শিষ্য ও পুত্র ইমাম জাফর আল সাদেক এবং তাঁর মাধ্যমে মজহবের ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক এবং তরিকতের ইমাম বায়েজিদ বোস্তামী এবং এ রকম অন্যদের মাধ্যমে জগতে প্রচারিত হয়েছে।

এ নিবন্ধে যেহেতু শিয়া বা অন্য কোনো পার্শ্বধারা নিয়ে বিশ্লেষণে অবতীর্ণ হইনি, তাই এখানে সে নিয়ে আর বেশি বলব না। কিন্তু এ বিষয়ে আহলে হাদিস পার্শ্বধারা ধর্মতত্ত্ব বোঝা দরকার তার সুদূরপ্রসারী মনস্তাত্ত্বিক ও তন্মাধ্যমে রাজনৈতিক ফলাফল বুঝবার জন্য।

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) উপরোল্লিখিত কথা দুটির সমন্বয়মূলক যে ব্যাখ্যা 'আহলুল সুন্নত ওয়াল জমায়াত' তথা, মূল আহলুল হাদিসসহ বিশ্বের প্রায় সব মুসলমানই গ্রহণ করলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ সূচিত 'আহলে হাদিস' কিন্তু তা গ্রহণ না করে বরং নবীবংশ সংক্রান্ত দ্বিতীয় কথাটি উহ্য রেখে, কিতাব ও সুন্নত সংক্রান্ত কথাটির ব্যাখ্যা করলেন এই যে, এর অর্থ হাদিসের আলোকে কোরআন বুঝে তা অনুসরণ করতে হবে। হজরত মোহাম্মদের (দঃ) কথায় কিন্তু কোরআন আর হাদিসের কথা বলা হয়নি- বলা হয়েছে আল্লাহর কিতাব, আর তাঁর (দঃ) সুন্নতের কথা। সুন্নত হাদিস নয়- কিছু কিছু সুন্নত হাদিসে ধরে রাখা হলেও সুন্নতসমগ্র হাদিসসমগ্রের চেয়ে বহু বেশি ব্যাপক। শুধু হাদিসে উল্লিখিত সুন্নত ধরে বাদবাকি সুন্নত বাদ দিয়ে দিলে সুন্নত অনুসরণের ঐ ভ্রান্ত পথ অন্ধের হাতি দেখার মতো হবে। ইসলামের প্রধান মূলধারা, তথা মুসলমান সমাজসমগ্রের বিশ্বাস মতে, সুন্নত সন্ধান করতে হবে হাদিসের ৪৯ শুদ্ধ পুস্তকে, কিন্তু সেখানেই থামলে চলবে না। মূল আহলুল হাদিসের আদি ইমাম, প্রথম যুগত্রয়ের যে মদিনা শরিফ তারই আদরণীয় ইমাম মালিক এ বিষয়ে যা বলেছেন, আহলুল হাদিস আহলুল রায় নির্বিশেষে ধর্মের প্রধান ও মূলধারার সকল মজহব ও সব তরিকাই এ বিষয়ে তা গ্রহণ করেছেন। তা হলো সুন্নতসমগ্রের বিশাল অধিকাংশই বিধৃত হজরত মোহাম্মদ (দঃ) তার শেখানো ধর্মনীতির তথা সুন্নতসমগ্রের ভিত্তিতে আদর্শ অনুসরণীয় সমাজ হিসেবে যে জীবন্ত 'মদিনা' সৃষ্টি করেছিলেন তার বাসিন্দাদের রীতিনীতিতেই। এ জন্য সুন্নতসমগ্রের আলোকে আল্লাহর কিতাবের অনুধাবন অনুসরণের অর্থই হলো প্রথম যুগত্রয়ের মদিনাবাসী সমাজসমগ্র এবং তাদের যেসব সাহাবি। মদিনাবাসী সাহাবি, তাবেয়ি, তাব-তাবেয়ি (রাঃ)-গণের রীতিনীতি এবং বোধ বুঝ (আরবিতে 'ফিকাহ'-এর আলোককেও এই কোরআন কেতাব বোঝার ভিত্তি করতে হবে। তাঁদের (রাঃ) বোধ-বুঝ, তথা 'ফিক্‌হ্'-এর আলোকে যা দেখা যায়, তাকে বলা হয় 'রায়' (আক্ষরিক অর্থেই 'যা দেখা যায়')। এই অর্থেই কোরআন-কেতাব অনুসরণে আহলুল হাদিসসহ 'আহলুল সুন্নত ওয়াল জমায়াতের তথা ধর্মের প্রধান ও মূলধারায় সব মজহব ও তরিকাই হাদিস এবং রায় উভয়ের অপরিহার্যতা স্বীকার করেন। এখানে একই বিষয়ে প্রাপ্ত একটি দুর্বলতর হাদিসের আলোকে কোরআন শরিফের ব্যাখ্যা এক রকম এবং দুর্বলতর হাদিসের পরিবর্তে শুধু অত্যন্ত সুঠাম। 'সহিহ' সনদের হাদিসের পরোক্ষ ইঙ্গিতের ভিত্তিতে সাহাবি, তাবেয়ি বা তবে-তাবেয়ির বোধ-বুঝ প্রসূত 'রায়' অন্যরকম দেখা গেলে কোনটি অনুসরণ বেশি ভালো। এই নিয়েই শুরু সেই মূল আহলুল হাদিস আর আহলুর রায়ের পার্থক্য ছিল। কিন্তু হাদিস এবং রায় উভয়ের আলোকের অপরিহার্যতার প্রশ্নে দুয়ে কোনোই পার্থক্য ছিল না। কিন্তু মূল আহলুল হাদিসের সঙ্গে নামের সামঞ্জস্যতা অর্জনে সচেষ্ট আহলে হাদিস পার্শ্বধারা রায়ের অপরিহার্যতা স্বীকার তো দূরে থাক তার আলোক ব্যবহারকে অনেক সময় 'শেরেক' তথা ধর্মত্যাগ পর্যন্ত মনে করতে শুরু করলো। অন্যদিকে আহলুল হাদিস যে ক্ষেত্রে রায়ের পরিবর্তে হাদিস নিতে গেলে 'দুর্বল' হাদিস গ্রহণের অপরিহার্যতা বোধ করেন, আহলে হাদিস সেখানে 'দুর্বল সনদের শুদ্ধ হাদিস গ্রহণেও অস্বীকৃত হয়। এভাবে রায় এবং দুর্বল সনদের শুদ্ধ হাদিস উভয়কেই অস্বীকার করবার ফল দাঁড়ায় এই যে গুটিকয় 'সহিহ' হাদিস ছাড়া কোরআন-কেতাব ব্যাখ্যায় আহলে হাদিসগণের নিকট নিজের মন ছাড়া আর কিছুই রইলো না। ফলে নিজের মনমতো কোরআন আর সীমিত ঐ কয় 'সহিহ' হাদিসের যথেচ্ছ ব্যাখ্যা দেয়ার রাস্তা তাঁদের জন্য খুলে গেল। এর ফলে প্রায় বাধাবন্ধনহীনভাবেই তারা নিজেদের মুসলমান সমাজসমগ্রের বিভিন্ন রীতিনীতিকে 'শেরেক' 'বেদাত', 'কুফর', 'ধর্মত্যাগ' ইত্যাদি বলে ফতোয়া দেয়ার অধিকারীই শুধু নয়- দায়িত্বপ্রাপ্ত বলে মনে করতে শুরু করলেন।

সৌভাগ্যক্রমে গত দেড়শ' বছর ধরে আহলে হাদিস পার্শ্বধারার অনুসারীরা ক্রমে সমাজসমগ্রের একটি ক্ষুদ্র পার্শ্বসম্প্রদায় হিসেবে পুঞ্জিভূত হলেও সম্প্রদায়ের সাধারণ সদস্যরা তার মূল সমাজসমগ্রের সঙ্গে তাদের মূল ধর্মতাত্ত্বিক পার্থক্য সম্পর্কে খুব একটা শিক্ষিত বা সচেতন হয়ে আসেনি। এর ফলে ঐরূপ সমাজসমগ্রের প্রতিপক্ষে ঐরূপ জঙ্গি মনোভাব সম্প্রদায়ের সাধারণ সদস্যের ভেতর জন্মায়নি। কিন্তু বারুদের গুঁড়ো তো পুঁতে রাখাই আছে, 'পটেনশিয়াল' তো স্বাভাবিক, ওপরে যেভাবে দেখালাম। এর সুযোগ নিয়ে যদি কেউ এই সম্প্রদায় থেকে লোক বেছে বেছে তাদের হৃদয় আহলে হাদিসের ঐ মূল ধর্মতত্ত্ব আবার শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে চাঙ্গা করে তোলে, তাহলে তার স্বাভাবিক পরিণতি তাই হবে যা ওপরে বিশ্লেষণ করা হলো। তা মুসলমান সমাজসমগ্রের জন্য যেমন ভয়ঙ্কর, খোদ আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের জন্য হয়তো আরো ভয়ঙ্কর। বিশালতর সংখ্যাগরিষ্ঠ এক সমাজসমগ্রের বিরুদ্ধে জঙ্গিবাদী হয়ে রুখে দাঁড়ালো।

সমাধান? : সমাধান কি? জটিল সমাজ মনস্তাত্ত্বিক সমাধান কি এত সহজ? বিশেষ করে যখন তা ধর্মের মতো অত তীব্র আবেগ-সঞ্জাত বিষয় নিয়ে। তারপরও ঠাণ্ডা মাথা নিয়ে। আবেগবিমুক্তভাবে, ভূত ভবিষ্যৎ বিবেচনা করে সমাধান বের করতে হবে। সমাধানের সূচনা আবেগমুক্তভাবে স্বসম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার সহিসী বিশ্লেষণেও তার প্রয়োজনীয় সংস্কার। আহলে হাদিস যদি আহলুল হাদিসের মৌলিক অবস্থানে যেতে পারেন, তাতে কাজ হবে অনেক সহজ। সমাজসমগ্রও যদি নিজেদের অবচেতন ধর্মবোধ-সঞ্জাত মনোজাগতিক চালিকাপ্রবাহ বুঝতে পারে, পেরে হতে পারে সহনশীল, তাতে কাজ আরো সহজ হবে। এসব দীর্ঘমেয়াদি মনন ও মনোন্নয়নের কাজ। স্বল্পমেয়াদ সন্ত্রাসকে অবিলম্বে ঠেকানোর বিকল্প নেই। সে সন্ত্রাস যেখান থেকেই হোক। কিন্তু আবারও বলি, দীর্ঘমেয়াদি সমাধান ছাড়া স্বল্পমেয়াদি পদক্ষেপ কার্যকরী হবে না। প্রতি বিদ্রোহী তত্ত্বের তাত্ত্বিক হিসেবেই এ কথা বলি।